দৈনিক মাধুকর | সোমবার | রেজিঃ রাজঃ ২৬৬ | গাইবান্ধা: বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২৫৩ | ২৮ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা | ২০ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি | পৃষ্ঠা ৪ মুল্য ৩ টাকা | ১৩ অক্টোবর ২০২৫ইং | শেষ পৃষ্ঠা

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫

'সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ'

বিশেষ ক্রোড়পত্র

SKS এসকেএস ফাউন্ডেশন

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং নদী প্রবাহের কারণে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে। নিম্নাঞ্চলীয় একটি দেশ হওয়ায় নদীভাঙন, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় এবং বৃষ্টিপাতের প্রভাবে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। উপকূলীয় অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উজানের ঢলের ফলে দেশের নদীগুলোতে পানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তাই এটি দুর্যোগের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র আর প্রান্তিক অধিকাংশ মানুষের বসবাস বন্যা ও খরাপ্রবণ তথা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায়। তাই সেই সমস্ত দরিদ্র আর প্রান্তিক মানুষেরাই চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে সবচেয়ে বেশি। চরমভাবাপন্ন জলবায়ু এমন একটি পরিস্থিতি, যার কারণে ঋতুভেদে তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেয় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে তীব্র শীত অনুভূত হয়। এই ধরনের জলবায়ুতে বছর ধরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ব্যাপক তারতম্য থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা করা এবং এসব ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামেরও ঘাটতি রয়েছে। ফলে দরিদ্র আর প্রান্তিক মানুষেরা আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত হওয়ার কারণে তারা আরও দরিদ্র হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

আজ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫'পালিত হচ্ছে। এ বছর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রতিপাদ্য "Fund Resilience, Not Disaster"- যার বাংলা করা হয়েছে 'সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ'। নির্ধারিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

১৯৮৯ সাল থেকে প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' উদযাপিত হয়ে আসছে। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের ব্যাপকতা প্রমাণ করে দুর্যোগের পূর্ব সতর্কীকরণ ও ঝুঁকি হ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হওয়া উচিত। এই পরিপ্রক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় জনগণের জন্য দুর্যোগ পূর্বাভাস ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগে জনগণের জানমাল ও পরিবেশ রক্ষায় তৃণমূল পর্যায় থেকে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের করণীয় নির্দিষ্ট করে ১৯৯৭ সালে প্রথম 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ভূমিকম্প, পাহাড়ধস, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরত্বপূর্ণ নির্দেশনাসহ করণীয় নির্ধারণ করে ২০১০ ও ২০১৯ সালে এ আদেশাবলি হালনাগাদ করা হয়।

আগাম সতর্ক বার্তার ওপর ভিত্তি করে দুর্যোগ আঘাত হানার পূর্বেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য ২০০৯ সাল থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় চিরাচরিত 'দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা' থেকে 'আগাম ব্যবস্থাপনা' কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি এক ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

এসকেএস ফাউন্ডেশন যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে কাজ করে, তাই জন্মলগ্ন থেকেই সংস্থাটি দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করে আসছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন বিগত প্রায় ৪ দশক যাবৎ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দুর্যোগমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে দুর্যোগ মোকাবিলায় মানুষের পাশে না থাকলে অন্যান্য উন্নয়ন সাফল্য স্থায়িত্বশীল হবে না। তাই সব দুর্যোগে মানুষের পাশে থেকে একটি দুর্যোগ সহনশীল বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এসকেএস ফাউন্ডেশন।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

সমন্বিত উদ্যোগেই দুর্যোগ প্রতিরোধ সম্ভব

সঞ্জয় চৌধুরী

১৩ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। দিবসটি পালনের জন্য জাতিসংঘ প্রথম উদ্যোগ নেয় ১৯৮৯ সালে। যার মূল লক্ষ্য- দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রতি বছরের মতো এবারও দিবসটি পালিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের জন্য দিবসটির নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "Fund Resilience, Not Disasters" বা "সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ।"

বাংলাদেশ একদিকে যেমন নদীমাতৃক, পলিবিধৌত, অন্যদিকে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, যেখানে উপকূলে ভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস ও খরাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বাড়ছে। জাতিসংঘের জলবায়ু ঝুঁকি সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তবে আশার কথা হলো- বিগত এক দশকে বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে।

১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে যেখানে লাখো প্রাণ হারিয়েছিল, সেখানে বর্তমানে একই মাত্রার ঝড়ে প্রাণহানি সীমিত। এর পেছনে কাজ করছে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধি। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, উপকূলীয় বনায়ন, আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক আজ দুর্যোগ মোকাবিলায় বড় ভরসা।

বাংরাদেশের 'কমিউনিটি বেসড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' মডেল বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। স্থানীয় মানুষকে প্রশিক্ষিত করে দুর্যোগকালীন সহায়তায় যুক্ত করা যেতে পারে। নারী, যুব ও শিক্ষার্থিরা দুর্যোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে সরকার দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুর্যোগের ধরণ বদলাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা শুধু প্রাকৃতিক

ক্ষয়ক্ষতি নয়; এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব। কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়ছে। শহরাঞ্চলে পানি নিষ্কাশন সংকট ও অগ্নিকাণ্ডের মতো মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বাড়ছে। অর্থাৎ, দুর্যোগ এখন কেবল প্রকৃতির বিষয় নয়; এটি উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্যোগের ক্ষতি তখনই কমানো সম্ভব, যখন মানুষ আগে থেকেই প্রস্তুত থাকবে। এজন্য স্কুল-কলেজ পর্যায়ে দুর্যোগ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ জরুরি। শিক্ষার্থীদের শেখানো উচিত- কীভাবে ভূমিকম্পে আশ্রয় নিতে হয়, কীভাবে আগুন লাগলে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হয়, কিংবা বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের আগে কী প্রস্তুতি প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ক্লাব, সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলার উদ্যোগ প্রশমন কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

দুর্যোগ প্রশমন শুধু ত্রাণ বা উদ্ধার কার্যক্রম নয়; এটি টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, প্লাস্টিক দূষণ কমানো, নদী-নালা সংরক্ষণ এবং জলাভূমি পুনরুদ্ধার- এসব উদ্যোগ দুর্যোগের ঝুঁকি কমায়। এক্ষেত্রে 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' কিংবা 'প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ' ধরনের নাগরিক আন্দোলন দুর্যোগ প্রশমনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে 'জলবায়ু সহনশীল কৃষি', 'ভূমিকম্প সহনশীল স্থাপত্য' এবং 'উপকূলীয় গ্রিনবেল্ট' গড়ে তোলার মতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এগুলো দুর্যোগ প্রশমনের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের দাবি। স্যাটেলাইট ডেটা, জিপিএস, ড্রোন এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আগাম সতর্কতা পৌঁছে দেওয়া, আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান জানানো বা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা নির্ধারণ এখন অনেক সহজ হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে ডিজিটাল তথ্যকেন্দ্রগুলো যদি দুর্যোগকালীন তথ্য হাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে জনগণ দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

প্রতিটি দুর্যোগই একেকটি শিক্ষা দেয়-কীভাবে প্রস্তুতি নিলে ক্ষতি কমানো যায়। বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নতি করছে। তবে এ অর্জন ধরে রাখতে হলে সরকারি সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। কারণ, দুর্যোগ প্রশমনের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো মানুষের সচেতনতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ।

দিবসটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়-প্রকৃতিকে জয় নয়, বরং তার সঙ্গে সহাবস্থানই আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার মূলমন্ত্র। জলবায়ু পরিবর্তনের এই যুগে আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত-পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হতে হবে।

দুর্যোগ প্রশমন দিবস তাই কেবল একটি দিবস নয়, এটি আমাদের টিকে থাকার দর্শন- যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা।

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে প্রয়োজন জনঅংশগ্রহণ

বাহারাম খান

ভৌগোলিক এবং অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষ জন্ম থেকেই অঞ্চলভেদে কোন না কোন দুর্যোগের সাথে পরিচিত। এইসব অনাকাঙ্খিত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি মানুষ তার অতীত অভিজ্ঞতা, লোকায়ত জ্ঞান, মেধা আর সক্ষমতা দিয়ে মোকাবিলা করে আসছে। গত দুই দশকে এই ভূখন্ডে ১৮৫টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্যোগের তীব্রতা ও ভয়াবহতা বেড়েছে বহুগুণ। দুর্যোগের কাছে মানুষ এখনো অসহায়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, টর্ণেডো, পাহাড়ধস, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারণে বিশ্বের কোন না কোন অঞ্চলের মানুষ প্রতিনিয়ত সম্পদহানী, প্রাণহানী ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন, প্রকৃতিতে মানুষের অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ, অবাধ পানি প্রবাহের পথে বাধাঁ সৃষ্টি, নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে দুর্যোগের ঝুঁকি বেড়েছে বহু গুণ। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা এবং আগাম প্রস্তুতি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতিকে অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারে। ব্যাপক জনসচেতনতা, যথা সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের মধ্যে লড়াই করে টিকে থাকবার শক্তিকে জাগিয়ে তুলে মানুষের জীবনে দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রচলিত ও ব্যবহার্য দুর্যোগ পূর্বাভাস ও পূর্ব প্রস্তুতির কারণে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, টর্ণেডো, পাহাড়ধ্বস, জলোচ্ছাসে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, প্রাণহানি, সম্পদ রক্ষা করা গেলেও প্রতিনিয়ত দুর্যোগের ধরণ পরিবর্তন হচ্ছে। বাংলাদেশে নতুন দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ভূমিকম্প, বজ্রপাত এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রার খরা। আশংকা করা হচ্ছে, আগামীর বাংলাদেশে সব থেকে বড় দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিবে উচ্চ তাপমাত্রা ও খরা। দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলকে খরাপ্রবণ হিসেবে মনে করা হলেও বর্তমান সময়ে দেশের প্রায় সব অঞ্চলে অতি উষ্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ জেলার প্রতিটি উপজেলার তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নেমে গিয়ে সমতল ভূমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে, নদীনালা, খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে এবং বৃষ্টির অভাব দেখা দিচ্ছে। খরার কারণে এ সকল এলাকার মানুষের জীবন-যাপন অসহনীয় হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক জীবনের পরিবর্তে সর্বত্র বিরাজ করছে ভয়াবহ অনাকাঙ্খিত দুর্যোগ। যে খরা, মরুময়তা, পানির অভাবকে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ভারতের কিছু অঞ্চলকে প্রবল বিপদ হিসেবে দেখা হতো, সেটাই এখন বাংলাদেশের জন্য দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে তা নিয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। মরুকরণ ও খরা বর্তমান বিশ্বের পরিবেশের জন্য সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে প্রতিবছর পৃথিবীর কোন না কোন অঞ্চলে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা মরুকরণ হচ্ছে যা মানব জাতির জন্য খুবই ভয়াবহ। খরার কারণে জীববৈচিত্র্য, পরিবেশগত নিরাপত্তা, আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা, টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত হবে যা অন্যান্য দুর্যোগের চাইতেও অধিক ভয়াবহ। মরুকরণ ও খরার কারণে আগামী এক দশকে প্রায় ৭৫ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে বলে জাতিসংঘ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। মরুকরণ ও খরা শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; এর ভয়াবহতা মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি, খাদ্য উৎপাদন ও সামগ্রিক অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত। দুর্যোগে কার্যকর সাড়া প্রদান, ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সক্রিয় ও তরান্বিত করতে বেশ কিছু আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ ইত্যাদি। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোসহ একাধিক প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয় কাজ করে গেলেও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ ও জনসচেতনতা একান্ত জরুরি।

মরুকরণ ও খরা মোকাবেলায় সরকার গৃহিত নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন জনঅংশগ্রহণ এবং ব্যাপক জনসচেতনতা। বনাঞ্চলে বৃক্ষনিধন বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি। বসতবাড়ি, পতিতজমি, রাস্তার দু'ধারে গাছ লাগানোর জন্য জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অতিমাত্রায় এবং অপ্রয়োজনীয় কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জলাভূমি ও বনাঞ্চল সংরক্ষণে সরকারের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ-বান্ধব কৃষি

পদ্ধতি অবলম্বনে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা করতে হবে। খরাপ্রবণ এলাকায় কৃষকদের খরাসহিষ্ণু ফসল চাষে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। খরাপ্রবণ এলাকায় সরকারি ও বে-সরকারি সহায়তায় যে সকল বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে, তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং নতুন জলাধার নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় ঝুঁকি সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যা দুর্যোগ সহনশীল সমাজ তৈরিতে সহায়তা করবে।

স্থানীয় পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণ ও জনসচেতনতার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় যে কাজগুলোকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে হবে তা হলোঃ ঝুঁকি সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা, দুর্যোগ সহনশীল সমাজ বিনির্মাণে প্রচারাভিযান, দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাব প্রশমনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও ত্রাণ গ্রহণের মানসিকতা পরিহার করে অভিযোজন কৌশল রপ্ত ও চর্চা করা।

খরার ঝুঁকি প্রশমনে লাগসই প্রযুক্তির বাস্তবায়ন

মোঃ আরাফাত ইসলাম

ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত বা সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি দুর্যোগের কারণ হতে পারে, যখন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বা কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় না। এই দুর্যোগগুলি প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব, দুর্যোগের কারণ এবং দুর্যোগ হ্রাস করার জন্য সক্রিয় পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেবলমাত্র প্রশমন করা যেতে পারে। যদিও দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা অসম্ভব, তবুও প্রতিরোধ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের কারণে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অদৃশ্য একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ "খরা" দিনে দিনে ভয়ানক আকার ধারণ করছে। অদৃশ্য বলার কারণ হলো, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বরেন্দ্র অঞ্চলে বর্তমানে চোখে দেখা যায় না; কিন্তু ক্রমশঃ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকট আকার ধারণ করে চলেছে। রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার নিচে নেমে যাওয়ায় তীব্র পানির সংকট দেখা দিয়েছে। নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও নিজামপুর উপজেলার কিছু কিছু অঞ্চলের অবস্থা এতই খারাপ যে, সেসব এলাকায় আবাদী জমি ক্রমেই ফলের বাগানে পরিণত হচ্ছে। পানির অভাবে এই সব অঞ্চলে তিন ফসলের পরিবর্তে শুধু বর্ষা মৌসুমেই ধান উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। রাজশাহীর তানোর উপজেলার বাধাইড় ও কলমা ইউনিয়নের অবস্থা এতটাই করুণ যে, সেখানকার বাসিন্দাদের মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে হয় খাবার পানি সংগ্রহের জন্য। শুষ্ক মৌসুমে এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ যেমন, রান্না, গোসল, কাপড় ধোয়া ও গো-খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পানির যোগান দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের সম্ভাব্য দুর্যোগ "খরা" এর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস ও খরা প্রতিরোধে পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এর আর্থিক এবং পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি সহায়তায় এসকেএস ফাউন্ডেশন রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলায় Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought) প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো ভূপৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মজুত বৃদ্ধি করা, কৃষিখাতে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খরা-সহিষ্ণু জীবিকায়ন নিশ্চিত করা; যা বরেন্দ্র অঞ্চলের খরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকরী অবদান রাখবে। উল্লেখিত লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নে প্রকল্পটির প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, মজা বা ভরাট হয়ে যাওয়া খাস পুকুর পুনঃখনন করা, খাল/খাড়ি পুনঃখনন করা, ছাঁদ ও পুকুরভিত্তিক Managed Aquifer Rrcharge (MAR) স্থাপন ও পরিচালন করা। পুকুর ও খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমাবে; যা খরা পরিস্থিতি তৈরিতে বাধাঁর সৃষ্টি করবে। অপরদিকে ছাঁদভিত্তিক বা পুকুরভিত্তিক MAR স্থাপন এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানিকে পরিশোধণের মাধ্যমে পানের উপযোগী করে ভূপৃষ্ঠে প্রবেশ করানো হয়। এ প্রযুক্তি ভূ-গর্ভে পানির মজুদ বৃদ্ধি করবে এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে। এসকেএস ফাউন্ডেশন গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভূপৃষ্ঠে পানির মজুদ বৃদ্ধির লক্ষে রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলায় ৭টি পুকুর ও ৪ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন কাজ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধিতে ৫০টি ছাঁদভিত্তিক MAR স্থাপন সম্পন্ন করেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা আমাদের হাতে নেই। তবে, সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কে অবগত হওয়া ও সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করা আমাদের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে।

আগাম প্রস্তুতিই দুর্যোগ মোকাবেলার উত্তম পন্থা

মোঃ জালাল উদ্দিন

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বৃষ্টি ও উজানের পানি প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত হয়। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশের জন্য বন্যা একটি সাধারণ আপদ; যা জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর তলদেশ ভরাট, নদী দখল, নদীর গতিপথ প্রতিরোধ, নদীতে অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, নদী সম্পর্কিত মৌসুম পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত হয়। বন্যার প্রভাবে নানা ক্ষয়ক্ষতির কারণে মানুষের স্বাভাবিক আয় কমে দারিদ্র্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইনফর্ম ঝুঁকি সূচক ২০২৪ অনুযায়ী পৃথিবীর উচ্চ ঝুঁকির তিনটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অন্যদিকে জার্মান ওয়াচ- এর প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম; যেখানে নদীভিত্তিক মৌসুমী বন্যার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ জেলা গাইবান্ধার মধ্যে দিয়ে বহ্মপুত্র, তিস্তা, করোতোয়া ও ঘা